Bangladesh Journal of Integrated Thoughts, 2022
DOI: 10.52805/bjit.v18i1.275

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার কবিতার ধারা

এ জেড এম আরফান হাবিব[১]

Poetic Trends of Ethnic Groups of Chattogram Hill Tracts

A Z M Arfan Habib

সারসংক্ষেপ

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম অরণ্য ও পাহাড়ের সমবায়ে গড়ে উঠেছে। এখানে চলমান নগরায়নের ছোঁয়া লাগলেও অধিকাংশ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী তাদের প্রকৃতিলালিত ঐতিহ্যবাহী ও পরম্পরাগত জীবনধারাকে বহন করে চলেছে আজও। ফলত এ জীবনের প্রতিভাস তাদের গীতিগুচ্ছ ও কবিতায় খুব স্বাভাবিক দাবিতেই অস্তিত্ববান। বলাবাহুল্য অস্তিত্বের এই সৌন্দর্য এখানকার প্রাকৃতিক বাস্তবতার অভিন্ন প্রকাশক ও উদ্দীপক। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন মনোমুগ্ধকর, তেমনই সুন্দর এখানকার আধিবাসীদের ঐতিহ্যবহনকারী বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি, যার প্রভাব চিন্তনে ও মননে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের হৃদয় জুড়ে রয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবে সে প্রভাব পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্যক্ষেত্রে, বিশেষত কবিতায় ছড়িয়ে রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতির লাবণ্যমাখা কবিতার সৌরভ বাংলাদেশের সাহিত্যের বৃহত্তর অঙ্গনের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন। সময়ের পরিক্রমায় কাব্যচর্চায় এ অঞ্চলের মানুষেরা বুনোফুলের মতো গোপনে কিংবা আড়ালে সৌরভ ছড়িয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার এগারোটি জাতিসত্তার মানুষ কবিতার ভাষায় নিজেদের প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে সহজ-সরল জীবনবোধের পাঠ। এই সব জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে যথাযথভাবে লালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারলে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ সংস্কৃতির উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর কবিতাপ্রেমী মানুষেরা খুঁজে পাবে ভালোলাগার নতুন ঠিকানা। পার্বত্য অঞ্চলের কবিদের আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছাগুলো বৃহত্তর পরিসরে উপস্থাপনের একটি প্রচেষ্টা বর্তমান নিবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ARTICLE HISTORY

Received 27 January 2022
Accepted 10 January 2023

মূলশব্দ

পার্বত্য চট্টগ্রাম, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, কবিতা, জীবনবোধ, আদীবাসী, ঐতিহ্য

[১] সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বান্দরবান সেনানিবাস।
Email: arfanhabib007@gmail.com

ABSTRACT

Chattogram Hill Tracts geographically presents a cohesion of woods and hills. The natural beauty influences the heart and mind of the people of Chittagong Hill tracts. Therefore, the traditional and colourful life manifests the natural reality here. In spite of the touch of ongoing urbanization, most of the ethnic groups still have been living their own traditional life. As a result, the effect of this life is present in the literature of Chittagong Hill tracts, especially lyrics and poems. Different poets of eleven ethnic groups, using their own different languages, have applied the lessons of simple life to express themselves. However, like wildflowers spreading aroma secretly, these poets have remained unknown to greater audience. Whereas, the poetic trend of the ethnic groups in Chattogram Hill Tracts can add to the variety of the wider poetic culture of Bangladesh giving new tastes to the poetry-lovers. Therefore, the fragrance of the poetry embellished with Chattogram's natural beauty need to be closely linked with the wider field of literature of Bangladesh. This article is an attempt to appreciate the emotions, feelings and thoughts of the poets of highlands.

KEYWORDS

Chattogram Hill Tracts, ethnic groups, poetry, traditional ethnic values

সৃষ্টিজাত পাহাড়ে আল্পনা এঁকে দেয় নদী, ছড়া, ঝরনার সমবায় আত্মীয়তা। প্রকৃতির রহস্যঘেরা পার্বত্য চট্টগ্রামে ছড়িয়ে রয়েছে অসাধারণ এক সাংস্কৃতিক পরিচয়। এখানকার বৃহৎ নৃ-গোষ্ঠী চাকমা ও মারমাসহ ১১টি নৃগোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব ভাষা এবং সংস্কৃতি। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। তাদের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয়ান পরিবারের ইন্দো-ইরানীয় শাখার অন্তর্গত (ইসলাম, ২০১২)। মোট ১১টি উপজাতির মধ্যে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা ছাড়াও মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, চাক, লুসাই, পাংখুয়া, বম, খ্যাং এবং খুমী উপজাতিদের ভাষাসমূহ সিনো-টিবেটান পরিবারের টিবেটো-বার্মেন শাখার অন্তর্ভুক্ত (ত্রিপুরা, ২০০১)। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা ছাড়াও মারমাদের বর্ণমালা রয়েছে। পার্বত্য পরিবেশ এবং নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি তাদেরকে করেছে সমতল থেকে ভিন্নমাত্রিক প্রকৃতিময়। পরিবেশ ও প্রতিবেশের স্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায় তাদের কাব্যচর্চায়, যেখানে রয়েছে প্রকৃতির সারল্যের নিবিড় প্রকাশ।

নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী কবিরা তাদের কাব্যচর্চার ধারাকে চলমান রেখেছেন। যদিও আদিবাসীরা অত্যন্ত আত্মগত জীবন যাপনে অভ্যস্ত (ত্রিপুরা, ২০০১)। ফলত সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে আদিবাসী কবিদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো নয়। তবুও খুঁজে নেয়ার মতো অনেক কিছুই আছে এ পার্বত্য জনপদে। গত শতকের দ্বিতীয় দশকের পূর্ববর্তী আদিবাসী সাহিত্য ধর্মীয় ও লোকসাহিত্য নির্ভর ছিল (চাকমা, ২০০২)। রাধামন ধনপুদি পালা কিংবা গোজেন লামা'র কবিতা ছাড়া আর তেমন কিছুর খোঁজ পাওয়া যায় না (চাকমা, ২০০২)। পরবর্তীকালে তিন পার্বত্য জেলার উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এর প্রকাশনা বিভাগের কার্যক্রম আদিবাসী কবিদের পথ চলায় গতিসঞ্চার করে। পাশাপাশি ব্যক্তি উদ্যোগে বেশ কিছু কবিতা সংকলন এবং উৎসব কেন্দ্রিক

প্রকাশিত সংকলন এ অঞ্চলের কাব্যচর্চার একটি কাঠামো নির্মাণ করে। *রান্যাফুল* (২০০৬), *বিংশ শতাব্দীর নির্বাচিত কবিতা* (২০০৮), *চাকমা কবিতা* (২০০৮)'র মতো সমৃদ্ধ কিছু কবিতা সংকলন– আমাদের আদিবাসী কবিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। অনেক আদিবাসী কবি নিজেদের ভাষায়ও কবিতা লিখেছেন বেশ সাবলীলভাবে।

'পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার কবিতার ধারা' শিরোনামের আওতায় বর্তমান নিবন্ধে মূলত পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক কবিদের বাংলা ভাষায় লেখা কবিতার ধারাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, চলমান বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বা আদিবাসীদের কাব্যচর্চার সমকালীন রূপটি কেমন তা অবলোকনের লক্ষ্যে এই বিশিষ্ট প্রয়াস। ফলত নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনা এখানে বৃহৎ পরিসরে উপস্থাপিত হবে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ, সাময়িকী ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পার্বত্য চট্টগ্রামের কবিদের সাহিত্যচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের কবিতার ধারা থেকে স্বতন্ত্র এই ধারার কাব্যের রূপ বৈচিত্র্য কিছুটা ভিন্নমাত্রায় প্রকাশিত এবং বিকাশিত। সাহিত্য ও নন্দনচর্চায় পার্বত্য-অঞ্চলের কবিদের নিরলস পথচলায় অনেক হিরণ্যশস্য সঞ্চিত হয়েছে কালের গর্ভে। কবিতা রচনা তাদের অনেকের কাছে সৃজন ও মননের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জনের অবলম্বন। এছাড়া তাদের নিজ ভাষায় রচিত কিছু কবিতার বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত রূপকেও বিবেচনা করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা ও মারমা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর। অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী যেমন– খুমি, লুসাই, খেয়াং, চাক জাতিসত্তার জনসংখ্যা অত্যন্ত কম। ফলে সাহিত্য সভার বিশাল পরিমণ্ডলে তাদের আনাগোনা কম। আলোচনার সুবিধার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের কবিতাকে ৩টি উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত করা হলো–

ক) চাকমা কবিতা
খ) মারমা কবিতা
গ) অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর কবিতা।

ক) চাকমা কবিতা

বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাংশে শৈল জনপদের প্রাতিষ্ঠানিক নাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম। এই অঞ্চলে চাকমা জাতির বাস বেশ প্রাচীন। ইন্দো-ইরানীয় ভাষাবংশের অর্ন্তভুক্ত চাকমা ভাষা। আদিবাসীদের মধ্যে এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বা জাতিগোষ্ঠী। তাদের নিজস্ব বর্ণমালা ও সমৃদ্ধ লোকসাহিত্য রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিকবি–শিবচরণ। তিনি এই জনপদে পথ-প্রদর্শক কবি (চাকমা, ২০০৮)। তাঁকে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি বলে ধারণা করা হয়। তিনি এক ধরনের বিশেষ কবিতা লিখেছিলেন- যেগুলোকে বলা হয় 'লামাহ্' (স্রষ্টার প্রতি প্রার্থনা)। তাঁর রচিত সাতটি লামাহ্ নিয়ে সংকলিত গ্রন্থের নাম *গোঝেন লামাহ্*। এসব লামাহ্ কবিতায় স্রষ্টার প্রতি নিবেদন ও প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে। শিবচরণের কবিতার জনপ্রিয় দুটি পঙ্‌ক্তি হলো–

যে বর মাগে সে বর পায়
গোঝেনে বর দিলে ন ফুরায়। (চাকমা, ২০০৮)

প্রসঙ্গত, কবি শিবচরণের প্রকাশিত গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য এবং তাঁর রচিত গ্রন্থটির রচনাকাল সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

চাকমা সাহিত্যের আধুনিক কালের সূত্রপাত বিশ শতকের প্রথমার্ধে– ১৯২৬ সালে, কবি ফিরিঙচানের (কবি ফিরিঙচানের প্রকৃত নাম প্রবোধ চন্দ্র চাকমা। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বরকল থানায় তার নিবাস ছিল) বাংলা বর্ণে চাকমা ভাষায় রচিত 'আলঝি মিলার কবিতা' ('আলঝি মিলার কবিতা'-এর

বাংলা অর্থ– অলস মেয়ের কবিতা) নামে একটি কবিতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। পরবর্তীকালে এই কবিতাটি তাঁর *আলসি কবিতা* (১৯৩০ সালে বাংলা বর্ণে চাকমা ভাষায় *আলসি কবিতা* বইটি প্রকাশিত হয়) গ্রন্থে সংকলিত হয়। কবিতাগুলো বেশ জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। এর ভাষা বেশ সাবলীল এবং ব্যাঙ্গাত্মক। আলস্যের কারণে অলস ব্যক্তির কী সমস্যা হয় এবং অলস মেয়েরা যে অন্যের উপহাসের পাত্রী হয়, তার বর্ণনা আছে এতে–

আলসি মানস্যে প্রত্যেক দিনত
দিনত যানছে ঘুম
ফেজেরায়দি চিনা যায়ছে
আলসি মানস্যের জুম।

আলসি মানস্যর মুখৎ শুনা যায়
উয়ান ইয়ান নেই।
নেই শব্দউয়া কিদ্যায় অইয়ে
আলসি মানস্যথেই। (দেওয়ান, অক্টোবর ২০০৬)

সুগত চাকমা কর্তৃক অনুবাদ (বাংলায়):

অলস লোকে প্রতিদিন
দিনে যাবে ঘুম।
আগাছায় পূর্ণ হয়
আলসে লোকের জুম।

অলস লোকে প্রতিদিন
নেই নেই শব্দ করে
নেই শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে
অলস লোকের তরে। (দেওয়ান, অক্টোবর ২০০৬)

চুনীলাল দেওয়ান চাকমা কবিতার ধারায় এক উজ্জ্বল নাম। ১৯৮০ সালে তাঁর গীতিকবিতার সংকলন *নিবেদন* প্রকাশিত হয়। *গৈরিকা* পত্রিকায় চাকমা চিত্রশিল্পী ও কবি চুনীলাল দেওয়ান (১৯১১-১৯৫৫) এর অনেকগুলো কবিতা প্রকাশিত হয়। চাকমা রাণী বিনীতা রায় সম্পাদিত, গৌরিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক নামকৃত। ১৯৪১ সালে চাকমা রাণী বিনীতা রায় কবি চুনীলাল দেওয়ানের 'ঘর দুয়ারত' শিরোনামের একটি কবিতা বাংলায় অনুবাদ করে *গৈরিকায়* প্রকাশ করেন। যেখানে কবির প্রথম ভালোলাগার পাহাড়ি নারী প্রতি ভালোলাগার সরল বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে এভাবে–

কুটীর দুয়ারে এসে ডাকে
সে কি গো মোরে,
মুখ চিনিনা নাম জানি না
কোথায় দেখিনু তারে।
ডাক শুনিয়ে ভুলে গেনু
যা ছিল মোর কাজ,

সাধ হতেছে তারে ডেকে
নাম সুধাই গো আজ।
পরিচয়ের পালা শেষে
তারে ডেকে লয়ে
সোহাগ ভরে ভিতরে বসে
কথা বলবো দোঁহে।
কথা কয়ে মন মজিলে
থাকতে বলব তারে,
আমার সাথে জন্মের মত
আমার কুটীর দ্বারে। (দেওয়ান, অক্টোবর ২০০৬)

খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালাবাসী মুকুন্দলাল তালুকদারের (১৯২৫-১৯৮০) কবিতা 'পুরান কদা' (পুরানো কথা) চাকমা কবিতায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন; *গৈরিকা*, বিনীতা রায় সম্পাদিত, বর্ষ ১২, সংখ্যা ১৩-এ প্রকাশিত। এ কবিতায় ছেলেবেলার স্মৃতির পুনরুক্তি পাঠকের নজর কাড়ে–

পুরান কথা মনে পড়লে মন যে কেমন করে,
ইচ্ছে করে সে সব স্মৃতি রাখতুম জনম ভরে।
ছোট্ট বেলায় সে সব খেলা, সঙ্গী সাথি যারা
কালের স্রোতে হারিয়ে গেল এখন কোথায় তারা?...
পাহাড় 'পরে মোনঘরে বাঁশী নিয়ে একা,
দখিন হাওয়া বইছে তখন একলা তুমি সেথা।
ধানের শীষ নুয়ে এলে টিয়া তাড়াবো বলে,
তাইতো সেথায় পিতামাতা রেখে গেল মোরে।...
সে সব দিনের হাসি রঙ্গ, সঙ্গী সাথী ভাই
কোথায় গেলো হারিয়ে সবে আমার যে কেউই নাই। (দেওয়ান, অক্টোবর ২০০৬)

চাকমা রাজবংশে জন্মগ্রহণকারী কবি সলিল রায় (১৯২৮-১৯৮১) ষাট-এর দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলায় কবিতা রচনার পাশাপাশি বেশ কিছু গানও লিখেছেন তিনি। গত শতকের পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের গোড়ার দিকে তাঁর লেখা কবিতাগুচ্ছের কোনো সন্ধান মেলেনি। চট্টগ্রামের বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছিলো। বান্দরবান থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক *ঝরণার* প্রথম বর্ষ ২য় সংখ্যায় (১৯৬৩) প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতা 'অলিখিত কাহিনীর একটি নায়িকা'। মাসিক *পার্বত্য বাণী*তে প্রকাশিত হয় 'একটি চিঠির উত্তর' (১৯৬৮), 'দুঃস্বপ্ন' (১৯৬৮), 'রাষ্ট্রের জন্মদিন' (১৯৬৮) সহ বেশ কিছু কবিতা। 'স্বপ্ন ও বাস্তব' কবিতায় পাহাড়ের সারল্য জীবনের কথা উঠে এসেছে নিম্নের পঙ্‌ক্তিগুলোতে–

নিথর পৃথিবী বুঝি ঘুমে অচেতন
আকাশে রূপালী চাঁদ মধু হাসি হাসে
চারিদিকে ঝিরিঝিরি বাতাসে কাঁপন
দূর থেকে পাহাড়িয়া সুর ভেসে আসে। (রায়, নভেম্বর ১৯৬৮)

কবি সলিল রায় রাবীন্দ্রিক বলয়ে আবিষ্ট। তাঁর সূক্ষ্ম ও গভীর জীবনবোধ ছিল। ছন্দবদ্ধ করেই কবিতার গ্রন্থনায় তিনি উদ্যোগী ছিলেন। এতে তিনি সাফল্যও অর্জন করেন। তেমনই একটি কবিতা 'বর্ষার দিন আমার' এর অংশ বিশেষ–

পানি ভরা আকাশে হিম হিম বাতাসে
ঝির ঝির ধারা নামে ঘোর বারিষায়
বাদলার দিন তাই দিন যায় বাসিয়াই
একটানা বসে থাকা শুধু একেলায়।
দেখা যায় দূরে জুম কুয়াশা হেন
গাঁয়ের সকাল লাগে নতুন যেন
জলপথ ঘাসে কদিনেই ভরিয়াছে
গাছপালা ডগা মেলি চায় কিগো চায়। (দেওয়ান, অক্টোবর ২০০৬)

ইংরেজি সাহিত্যে উচ্চডিগ্রিধারী পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেম ও বিষাদের কবি দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমা (১৯৪৯-১৯৯৬)। ১৯৬৭ সালে বান্দরবান থেকে প্রকাশিত *ঝরনা* পত্রিকায় 'শুধু তোমারি জন্য' কবিতা লিখে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৭৪ সালে তাঁর রচিত 'কখনও আনমনে' কবিতাটি রাশিয়ায় একটি সংকলনে রুশ ভাষায় অনূদিত হয়। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর কাব্য গ্রন্থ-অন্তর্গত বৃষ্টিপাত। ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় 'পাদারঙ কোচপানা' (সবুজাভ ভালবাসা)। জীবনের শেষ কয়েকটি বছর তিনি খাগড়াছড়ি মহাজন পাড়ায় তাঁর পিতৃগৃহে কাটিয়েছিলেন। নিবিষ্ট আবেগী এই কবি 'কখনও আনমনে' কবিতায় নির্জনতাকে আত্মস্থ করেছেন এভাবে–

কতবার মনে হয় প্রজাপতি হয়ে ভেসে যাই দূরে
নীল পাহাড়ে ঘাসে হ্রদের কিনারে
উড়ে চলি পাখা মেলে পাতার আড়ালে মিশে যাই,
জীবনের পথ ভুলে অরণ্যের সুনীল বিথারে।
হতে চাই কখনও বা উড়ে চলা একাকী পায়রা
নীলিমায় ভেসে যেতে মন চায় বারে বারে,
উদাস দুপুর বেয়ে উড়ে যাই দোয়েলের মত
সময়ের দায় ভুলে চির চেনা ব্যথার ওপারে
এমনটি হতে কেউ চাও কি গো তোমরা এখানে
ফুলে ফুলে ঘুরে ফেরা মধুমতি ভোমরার টানে
চন্দনা পাখিটি হতে কখনও পিপাসা জাগে যদি
হৃদয়কে করে দিও শৈশবের ইছামতী নদী। (চাকমা, ২০০৮)

১৯৭০ সালে সুগত চাকমা (জন্ম: ১৯৫১) রচিত *রাঙ্গামাত্য* নামে একটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়। কবি সুগত চাকমা ১৯৫১ সালে ২৪ মার্চ রাঙ্গামাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাঙ্গামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এর পরিচালক ছিলেন। শিশুদের উচ্চ শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি গঠনসহ নানা নৈতিক বিষয় এ কাব্যে উপস্থাপিত হয়। ১৯৭৮ সালে তাঁর দ্বিতীয় কবিতার বই *রংধং* প্রকাশিত হয়। তাঁর 'তোমার হৃদয়ে গেঁথে আছে তো' কবিতায় আমরা সরল রোমান্টিকতার স্পর্শ পাই–

তোমার মুখখানি তাকিয়ে সারারাত ফুরিয়ে গেলো

সারারাত্রি চারিদিকে ঝিঝু পাখি
জ্যোৎস্নার আলোতে গান গাইলো
জীবনের সেই রাত্রে হারিয়ে গেলো একটি দিন। (শর্মা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮)

প্রেমকে উপজীব্য করে তার অন্য একটি কবিতা 'আহ্লাদী মনের স্বপ্ন'। কবির রোমান্টিক মননের প্রকাশ এ কবিতাটি–

আহ্লাদি এমন স্বপ্ন দেখে অনেক দিন ধরে
তাতার ঘোড়ায় চড়ে সে হারিয়ে যাবে অনেক দূরে,
উজবেকিস্থান কাজাকিস্থান আর্মেনিয়ার পথ বেয়ে
কৃষ্ণসাগরের নীলকূলে তরমুজ চরে ঘুরবে।
যেখানে আঙুর আপেল নাশপাতির সাজানো বাগান
যেখানে আঙুর খেতে গিয়ে দুটো ঘোড়া মুখোমুখি দাঁড়াবে।
যেখানে অধর অধরের স্পর্শ পাবে
আঙুর রঙে রসে দু'টো অধর রাঙাবে।
সাধের এ জীবনে আহ্লাদী এ মন
অনেক দিন ধরে কাছে পেতে চায়,
তোমার সুবাসিত হৃদয়, হাসিখুশি মুখ,
সেথা আমি তোমারেই যেন শুধু পাই। (দেওয়ান, অক্টোবর ২০০৬)

কবি সুসময় চাকমা তাঁর ব্যক্তিগত ভালোবাসার কথা বর্ণনা করে 'ম কোচপানা' নামক কবিতা লিখে আত্মপ্রকাশ করেন। কবি সুসময় চাকমা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্তমান খাগড়াছড়ি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এর পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন। ব্যক্তিগত অভিমানের তীব্রতা 'মুই এক্কেবারে যাইম' কবিতাটিতে অনুভব করা যায়। স্বকৃত বঙ্গানুবাদ–

একেবারেই যাবো
যাবার সময়
এলাকার সেই বসন্ত পাহাড়ের মাটির বুক
ভূমিকম্পে কেঁপে উঠবে
ছিলচদিগাঙের এপার ওপার
যখন আমি একেবারেই যাবো। (চাকমা, ২০০৮)

কবি সুহৃদ চাকমার (১৯৫৮-১৯৮৮) কাব্যগ্রন্থ *বার্গী* ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়। কবি সুহৃদ চাকমা ১৯৫৮ সালে ২০ জুন খাগড়াছড়ি দীঘিনালা থানাধীন বাঘাইছড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। এতে তাঁর জনপ্রিয় কবিতা 'রাঙ্গামাত্যা' কবিতাটি সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছে। কবিতাটিতে নিজের জন্মস্থানের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহের স্পর্শ দেখা যায়–

আমার প্রিয় রাঙ্গামাটি
প্রতিদিন ছড়ানো ছিটানো লালমোরগ ফুলে
সাজানো নববধূ

বান-ভাসা উচ্ছ্বাসে ঠোঁট দু'টি কেঁপে ওঠে
স্বপ্ন কামনায় সৃষ্টির মিষ্টি ইশারায়। (চাকমা,অক্টোবর ১৯৮৭)

নিঃসঙ্গতার রাঙতা-মোড়ানো খরস্রোতা পাহাড়ি ঝিরির সুদূরপিয়াসী এক মাঝিকে পাওয়া যায় সুহৃদ চাকমার কবিতায়। তাঁর কবিতায় রয়েছে বিকাশপ্রবণ ব্যক্তিসত্তার সংশয়ী দোলাচলতা।

কবি ফেলাজিয়ার চাকমা (জন্ম: ১৯৪৪) কর্তৃক ১৯৭৩ সালে রচিত 'জুমবী পরাণী মর' কবিতায় জুম জীবনের আলেখ্য দেখা দেয়। একই রকম সৌন্দর্য বোধ লক্ষ্য করা যায় কবি পরিমল বিকাশ চাকমার কবিতায়। তাঁর রচিত 'সত্রং ফুল'-এর অংশবিশেষ–

রঙ রঙ শুধু রঙ
জুম ভরা শুধু রঙ
সুন্দর অপরূপ
সত্রং ফুলের রঙ
থরে থরে ফুলেরা
সারা শৈল রাঙালো
যেন কোন রূপসীরে
অপরূপে সাজানো। (চাকমা, ২০০৮)

চাকমা কবিতার ধারায় ডা. ভগদত্ত খীসা (১৯৩৩-২০০২) রসাত্মক এবং ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করেন। তিনি রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচর এ জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন থেকে তাঁর লেখালিখি শুরু। বিভিন্ন সাহিত্য সাময়িকীতে তিনি নিয়মিত লিখতেন। তাঁর রচিত 'কেমন আছি' কবিতায় পাহাড়ি জীবনের বাস্তবতা প্রকাশিত–

এক আড়ি ধানের দু'আড়ি খৈ
সেই দিন গেল কই?
তখন পাহাড়-পর্বত, ঝোপ-ঝাড়
আগে ছিল মাটি উর্বর ।
এক আড়ি ধানের ছয় কুড়ি ধান
গোটা জুমে হঠাৎ কার্পাসে জুড়ায় প্রাণ।

আর এখন?
জুম রয়েছে ধান নেই
ধান্য জমি ডুবে যায়
পাহাড় রয়েছে গাছ নেই
আকাশ রয়েছে বৃষ্টি নেই। (দেওয়ান, অক্টোবর ২০০৬)

কবি সুপ্রিয় তালুকদার (জন্ম: ১৯৪৯) বাংলা ও চাকমা ভাষায় কবিতা লিখেন। তাঁর কবিতায় নারী, প্রেম, স্বদেশ ও রোমান্টিকতার ছোঁয়া পাওয়া যায়। কবি সুপ্রিয় তালুকদারের জন্মস্থান রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচর। ছাত্রজীবন থেকে তাঁর লেখালিখি শুরু। ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *নীলিমায় নীল*। কবিতা ছাড়াও বিভিন্ন গবেষণাধর্মী লেখা লিখেছেন। *চাকমা সংস্কৃতির আদিরূপ* (১৯৮৭)

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। আদিবাসীদের কবিতায় দৈহিক ভালোবাসার প্রকাশ প্রায় অনুপস্থিত। তবে সুপ্রিয় তালুকদারের 'চাওয়া পাওয়া' কবিতায় এর কিছুটা ছোঁয়া পাওয়া যায়–

অন্ধকারে শিহরণ জাগা প্রথম রাতে
অগ্রহায়ণের হাল্কা শীতে
তোমার উষ্ণ শরীর ছুঁয়ে যা পেয়েছি
সেটুকুইতো আমার জীবন ভর
চাওয়া পাওয়া
ভালোবাসার দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া। (তালুকদার, ২০০৫)

৭০-এর দশকের শেষ দিকে নিভৃতচারী কবি শ্যামল তালুকদার (জন্ম: ১৯৫৬) *গিরিনির্ঝর* পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা 'স্মৃতি মর জনমর' প্রকাশ করেন। তিনি রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। স্কুল জীবন থেকেই তিনি লেখালেখি শুরু করেন। তার 'অবাধ্য হওয়ার মতো' কবিতায় আমরা দেখি পাহাড়ী সারল্যমাখা অনুভব–

অবাধ্য হওয়ার মতো কখনো কখনো
মন আমার পাখি হয়ে ডানা মেলে উড়ে যায়
রাঙ্গামাটি শহর ছেড়ে কোন
এক রূপসীর টলমলে যৌবন যেন
শরতের কাপ্তাই হ্রদের শরীর ডিঙিয়ে
দূরে, তারপরে আরো দূরে,
যেখানে নীলাম্বর শিথান দিয়ে ঘুমায়
সবুজ পাহাড় আর গহীন অরণ্য
নীল সবুজের অমলিন
ভালোবাসা মাখামাখি চিরকাল,
জলজ প্রাণীর জলই যেমন নিবিড় আশ্রয়। (দেওয়ান, অক্টোবর ২০০৬)

যে-মাটির সন্তান কবি, তার প্রতি মমত্ববোধ, ভালোবাসা, তার প্রতি প্রগাঢ় বেদনা-অনুভব কবিতার বিষয়-আশয় হয়ে ওঠে অনায়াসে। সমতল ভূমির মানুষের মতো স্বাভাবিক-সরল জীবন নয় পাহাড়িদের। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা, নানা সামাজিক প্রতিবন্ধকতার ভেতর দিয়ে সময় পার করতে হয় তাদেরকে। সমতলের সাধারণ জীবনের প্রতি তাদের আকর্ষণ থাকতে পারে; মনে থাকতে পারে না-বলা কোনো কষ্ট-কথা। কিন্তু তাই বলে স্বদেশের প্রতি, মাটির প্রতি, জন্মভূমির প্রতি তাদের আবেগ অন্য সব লোকের মতোই স্বাভাবিক।

দেবাশীষ রায় (জন্ম: ১৯৫৯) নিয়মিতভাবে কাব্যচর্চা করছেন। গান রচনায়ও তাঁর বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। তিনি বৃহত্তর চাকমা সার্কেলের রাজা। চাকমা ঐতিহ্যকে ব্যবহার করে তাঁর লেখা কবিতা 'বিঝু দিনে মনপুদিকে' কবিতার অংশ বিশেষ–

ফুল বিঝুর মিষ্টি হাওয়ায়
তোমাকে দেখতাম
তোমাকে দেখতাম আমি ভোরের

হিমেল হাওয়ায় ফুল তুলতে
ফুলের ঝুড়ি নিয়ে
নদীর কূলে কূলে হেঁটে যেতে
গঙ্গা মাকে ফুল দিয়ে প্রণাম করতে
শামুক লেজের আঁকা ফুলের
পিনোনের উপরে খাদি বেঁধেছ
ভাবতে বেসামাল হতাম
আমি কোনটি সুন্দর ভেবে। (চাকমা, ২০০৮)

৮০-এর দশক থেকে যে কজন চাকমা ভাষায় কবিতা লিখেছেন কৃষ্ণচন্দ্র চাকমা (জন্ম: ১৯৬০) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তরুণ বয়স থেকেই ভ্রাতৃত্ববোধ, সম্প্রীতি, দেশপ্রেম বিষয়কে অবলম্বন করে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। রাঙ্গামাটি জেলার বরকল থানার গোরস্থান গ্রামে তাঁর জন্ম। বর্তমানে তিনি পার্বত্য জেলা পরিষদে কর্মরত আছেন। বিভিন্ন সাহিত্য সাময়িকীতে তিনি নিয়মিত লেখেন। সমাজের অসংগতি নিয়ে তাঁর লেখা 'এই রকম কেন' কবিতার অংশবিশেষ–

এই রকম হয় কেন?
এক শ্রেণীর মানুষ পাওয়ার তালে
হাত পেতে থাকে সব সময়
আর এক শ্রেণীর বঞ্চিত
আসল অবস্থান থেকেও অধঃপতনে
যেন বেশী করে বিপদে পড়া
অসহায় মানুষের মতো।

নিজের অবস্থানের অবনতি হবে কেন
শুধু স্বাক্ষী গোপাল কেন হব
খুব বেশী কম পাওয়া না হয়ে
যদি হিংসা হানাহানি না থাকতো
শান্তির সুবাতাস ফিরতো এ দুনিয়ায়। (দেওয়ান, অক্টোবর ২০০৬)

মাতৃভূমিপ্রীতি কেবল প্রশংসা আর আবেগে গাঁথা গল্প হবে, এমন তো নয়– মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পেতে পারে অভিমান, ক্ষোভ দিয়েও। যদি মাতৃভূমির শান্তি বিনষ্ট হয় কোনো কারণে, তাহলে জনমানুষের মনে ক্ষোভ জমতে পারে। কবিরা যেহেতু সমাজের সচেতন প্রতিনিধি, তাই তাঁদের চিন্তায় ধরা পড়ে নাগরিকের ওইসব না-বলা কথা। যে-কথা সাধারণ কোনো সামাজিকের পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, তা-ই হয়তো কবি তাঁর কথামালায় জনসমক্ষে তুলে ধরেন। মায়ের ভূমির প্রতি কিংবা বলা যায় নিজের জন্মভূমির প্রতি নিবিড় দায়বোধ থেকেই কেবল এমনটি সম্ভবপর হয়ে ওঠে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের কবিতায় পাওয়া যায় জন্মভূমির জন্য গভীর মমতার শব্দমালা।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ অমিতাভ চাকমা (জন্ম: ১৯৫৬) কানাডা প্রবাসী একজন বিশিষ্ট কবি। তরুণ বয়সে লেখা তাঁর প্রেমের কবিতায় প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যও সমানভাবে প্রকাশ পায়। তাঁর রচিত 'কোচপানা' (ভালোবাসা) কবিতার অংশবিশেষ–

ভালোবাসা

ফুরামোন পাহাড় হতে আরও উঁচু
আমার এ ভালোবাসা টুকু। (চাকমা, ১৯৯৫)

কবি মৃত্তিকা চাকমা (জন্ম: ১৯৫৯) বাংলা ও চাকমা ভাষায় নানা বিষয়ে কবিতা লিখেছেন। মৃত্তিকা চাকমা ১৯৫৯ সালে ১২ জানুয়ারি রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বন্ধুক ভাঙ্গার মুগছড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। মোনঘর আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় তিনি কর্মরত আছে। তাঁর প্রকাশিত কবিতার বই গুলোর মধ্যে *মনপরানী* (২০১৩), *এখনো পাহাড় কাঁদে* (২০১১), *মেঘ সেরে মোনোচুম* (২০১২) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর কবিতায় সমসাময়িক জীবন-যন্ত্রণা এবং রাজনৈতিক আবহ প্রবলভাবে বিদ্যমান। 'হৃদয়ের হ্যানসেক' কবিতায় তিনি নিজের প্রতিবেশকে প্রকাশ করেছেন এভাবে–

চব্বিশটি বছর পর নেমে এলো পর্বত থেকে
একটি হৃদয়ের হ্যানসেক।
একদা সেখানে ছিল বুলেটের ভাষা
সেখানে আজ হৃদয়ের হ্যানসেক।
রচিত হল আনন্দের বন্যা
সৃষ্টি হল স্বর্ণের সেতু
নেমে এলো স্বর্গের দূত, হাতে শান্তিরবাণী। (চাকমা, এপ্রিল ২০০২)

তাঁর রচিত 'হৃদয়ে পাহাড় কাঁদে' কবিতার কিছু অংশ–

ফুলগুলো তোলার মত নেই,
পাঁপড়ি ঝরে গেছে
পানিও নেই বিঝুফুল ভাসানোর।
হৃদয়ও নেই, বিবর্ণ হয়ে গেছে
কোথায় আর্শীবাদ চাইবো, ভেঙে গেছে
প্রার্থনার ঘর।
হৃদয়ের প্রেরণা কোথায় গিয়ে পাবো,
জড়িয়ে আছে হাতে পায়ে শৃঙ্খল
চোখের সামনে ঝুলছে শৃঙ্খলের মালা
অগ্নি হয়ে যাচ্ছে সমস্ত পাহাড় পর্বত। (দেওয়ান, অক্টোবর ২০০৬)

শিশির চাকমা (জন্ম: ১৯৬০) আশির দশক থেকে এ যাবৎ পর্যন্ত নানা বিষয়ে প্রচুর কবিতা লিখেছেন। ১৯৬০ সালের ২ ডিসেম্বর রাঙ্গামাটিতে কবি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৮ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। পেশাগতভাবে তিনি মোরঘর আবাসিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। প্রেম ও স্বদেশ বিষয় উপজীব্য তাঁর 'চিত মন আর নভিজে' কবিতায় পাহাড়ি জনপদের সৌন্দর্য বিলুপ্তির কথা হৃদয়স্পর্শী অনুভূতিতে ভেসে ওঠে। কবিতাটির অংশবিশেষ–

জোসনার উজ্জ্বল আলোয় পাহাড় ভিজে যায়
ভিজে যায় বিস্তীর্ণ উপত্যকা আর গ্রাম
বৃষ্টিতে ভেজা পাখির মত সবাই জবুথুবু
তবু কারও বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই।

জোসনার নিবিড় মাদকতায় সবাই মাতাল
ইদানিং সে জোসনায় আলো কেমন যেন অহংকারী
কেমন যেন পালায়নপর,
এ জোসনার আলোতে আর হৃদয়ে প্রশান্তি নামে না। (চাকমা, ২০১৪)

প্রেমের কবিতা 'তুমি না এলে' শিশির চাকমার একটি উল্লেখ্যযোগ্য কবিতা। এখানে সরল ভাষায় কবির অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে–

তুমি না এলে
দিন যাবে না
তোমায় না পেলে
রাত আসে না
হৃদয় বাগিচায় ঝড় উঠবে
ফুল ঝরবে আকুল পাথার
তুমি না এলে
হৃদয় ভাঙবে
তুমি না এলে
রাত আসে না
তুমি না এলে মেঘ কাঁদবে
চারিদিকে ঝড় নামবে
আমার সামনে বান উঠবে
সে বানে ভেসে যাবো
ভাসিয়ে নিলে ছায়া মিলাবো। (চাকমা, ২০০৮)

প্রগতি খীসা (জন্ম: ১৯৭৪) তাঁর কবিতার বই *মন চিদ আহন্ডি যায়* ২০০৮ সালে প্রকাশ করেন। চারপাশের দুঃখ-কষ্টের প্রকাশ তাঁর পঙ্‌ক্তি জুড়ে। 'প্রতীক্ষিত জীবন' কবিতার মধ্যে এই কবির জীবন দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়–

জীবন কি ভুলে যায় সময় কখনো স্থির নয়
স্থির নয় মানুষের রূপ, এমনকি নীরব কান্না?
সব আনন্দ, উল্লাস থেকে যায় গভীর রাতে
নিস্তব্ধ হয়ে যায় চিতার প্রজ্জ্বলিত আগুন,
পৃথিবীতে নেমে আসে নীরবতা।
ফিরে পেতে চাই আমার ফেলে আসা দিনগুলো,
এমনকি তোমার গভীর ভালোবাসা
চৈত্রের পখর রৌদ্রালোকে আমার উদাস চঞ্চল মন
গাঙচিলের মত উড়ে যায়
হৃদয়ের মণিকোঠায় উঁকি মারে যত সব স্মৃতি,
সবার জীবনে ভরে যাক অনাবিল সুখ-শান্তি। (দেওয়ান, অক্টোবর ২০০৬)

প্রকৃতিকে ঘিরে মানুষের প্রত্যাশারা দানা বাঁধে। স্বপ্নেরা খেলা করে নতুন নতুন সম্ভাবনার চাদরে গা ঢেকে। আর মাটিতে যে জীবন আবদ্ধ, মাটির গন্ধে যে-জীবনের স্বাদ থাকে লুকোনো, সেখানে মানুষ মাটির সাথে গড়ে তোলে আত্মীয়তা। সে আত্মীয়তার বন্ধনকে আরো নিবিড় করে তোলে পাখ-পাখালি, রাতের অন্ধার আর সবুজের অবারিত ইশারা। পাহাড়ের স্নেহে গড়ে-ওঠা কবিদের মনে তাই গজিয়ে উঠতে দেখা যায় হাজারো স্বপ্ন। কল্পনায় ভর করে তারা তৈরি করতে চায় মানবিক গল্প, বানাতে চায় ভালোবাসায়-গড়া এক নতুন পৃথিবী।

২০০৬ সালে হেমল দেওয়ান, শরৎজ্যোতি চাকমা, হিরনমিত্র চাকমা ও পল্লব চাকমা সম্পাদিত চাকমা কবিতা সংকলন *রান্যাফুল* প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির প্রকাশক মনি স্বপন দেওয়ান। এ গ্রন্থে চাকমা কবিতার বহুমাত্রিকতা প্রকাশিত। চাকমা কবিতা তার একুশ শতকের পথচলা সমুজ্জ্বল রেখেছে। অনাগত দিনে সময়ের প্রেক্ষাপটে এ পথ চলার গন্তব্য বহুদূর বিস্তৃত হবে তা অনুমান করাই যায়। সুগত চাকমার একটি সরল কবিতা 'তোমারই তরে'-এর অংশবিশেষ উল্লেখপূর্বক চাকমা-কবিতা-পর্বের আলোচনার সমাপ্তি করা হলো–

তুমি আসবে তাই এলো রবির কিরণ,
তুমি বেড়াবে তাই এলো জোছনা ভুবন
তুমি হাসবে তাই ফুল ফুটলো
তুমি গাইবে তাই পাখি ডাকলো। (চাকমা, ২০০৮)

খ. মারমা কবিতা

পার্বত্য চট্টগ্রামের দ্বিতীয় বৃহৎ জনগোষ্ঠী মারমা। মারমা ভাষায় কবিতাকে 'লাঙ্গা' এবং কবিকে 'লাঙ্গা চিওরি' বলা হয়। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে মারমা ছড়া-কবিতা মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। গত শতকের আশির দশক থেকে মূলত বাংলা হরফে মারমা কবিতা লেখা শুরু হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষু উ পঞ্ঞএ্যা জাত মহাথের, প্রয়াত আহামং মারমা, মংচিং প্রু, ক্য শৈ প্রু, ম্যামাচিং, অংসুই মারমা, মংপ্রু চৌধুরীসহ প্রমুখ কবি মারমা ভাষায় গান ও কবিতা লিখেন। অজ্ঞাত অনেক কবি মারমা ভাষায় কবিতা ও গান লিখেছেন। সংরক্ষণের অভাবে যা এখন দুষ্প্রাপ্য।

পার্বত্য বান্দরবান জেলার বাসিন্দা ক্য শৈ প্রু (জন্ম: ১৯৫৬) আশির দশকে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। গান, গীতি কবিতা লিখেছেন বিভিন্ন সাময়িক পত্রে। তাঁর রচিত মৈত্রী-মঙ্গল গান মূলত গীতি কবিতা। 'মৈত্রী মঙ্গলের গান' শিরোনামে একটি কবিতার উল্লেখ পাওয়া যায় বাংলা একাডেমির মাসিক *উত্তরাধিকার*-এর ৫২তম সংখ্যায় হাফিজ রশিদ খান এর 'পার্বত্য জনপদ পরম্পরার কবি ও কবিতা' প্রবন্ধে–

মৈত্রী ও মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ হোক
সুখী আর প্রাণবন্ত হোক
সকল মানুষ মাঙ্গলিকবোধে প্রস্ফুটিত হোক।
যারা বিদ্যালয়ে যায়, বিকশিত হোক
কৃষক ও জুমিয়ারা ফলবন্ত হোক
শ্রমজীবী জনসাধারণ আনন্দিত হোক
আমোদিত হোক সকলেই।
অমরাবতীর মতো চিরস্থিতি হোক আমার দেশের
সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উন্নত হোক

এই সভ্যতা, এই সংস্কৃতি চিরজীবী হোক
গীতি বাদ্য, শিল্পকলা চারুময় হোক আরও
জনসাধারণ, সকল শ্রমজীবী সুখী হোক,
সকল হৃদয় অপার আনন্দে উচ্চারিত হোক। (খান, কার্তিক ১৪২০)

গীতি কবি উ চ হ্লা মারমা ভাষায় বেশ কিছু গীতি কবিতা ও গান রচনা করেন। যা তাঁদের সম্প্রদায়ে বেশ জনপ্রিয়। আশির দশকে কবি ম্যামাচিংও বেশ কিছু গীতি কবিতা লিখেছেন। কবি অংসুই মারমা (জন্ম :১৯৬৪) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় পানখাইয়া পাড়ায় বসবাস করেন। তিনি বেশ কিছু বাংলা ও মারমা ভাষায় কবিতা রচনা করেন। পাহাড়, জুম, নদী তাঁর কবিতায় বহুমাত্রিকভাবে উপস্থাপিত। *দৈনিক গিরিদর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত 'সোনালী অতীত' কবিতায় তিনি লিখেছেন–

কুঞ্জবনে ঢাকা মায়াবী পার্বত্য চট্টগ্রাম
সোনালী প্রশান্তিতে ছেঁয়ে আছে আমার জন্মভূমি
আবহমান কালব্যাপী সুনিপুণ সুখে
ডাকো ডাকি সবুজ পাহাড় জুড়ে। (চাকমা, ২০১৫)

কবি মংক্য শোয়েনু নেভী (জন্ম: ১৯৬৪) আশির দশক থেকে মারমা ও বাংলা কবিতা লিখেছেন। কবি মংক্য শোয়েনু নেভী বান্দরবান পার্বত্য জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক-এ কর্মরত আছেন। মারমা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ঘিরে তাঁর মনোজগত তৈরি হয়েছে। তাঁর লেখা 'একটি নতুন ভাষা' কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হলো–

ফাল্গুনের দাবদাহে জন্ম নেবে
একটি নতুন ভাষা
নতুন বর্ণমালায় লেখা হবে
অনাদিকালের কাপ্যা
রদু, রাগাইন
জাতক-পিটক
বিনির্মিত হবে
নবতর ব্যঞ্জনায়,
প্রজ্জ্বলিত আমাদের
আদি পিতার মশালে
আজো পাহাড়ে
স্বর্ণাভ আলো কাঁপে
আদিম হুঙ্কারে আজো ভাঙে
পর্বতের মৌন মুখরতা। (চাকমা, ২০১৫)

ছড়াকার কবি চাই সুই হ্লা ১৯৮৩ সালে রাঙ্গামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত কবিতা রচনা প্রতিযোগিতায় মারমা কবিতা লিখে প্রথম স্থান অর্জন করেছিলেন। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত তরুণ কবি উশৈপ্রু'র (জন্ম : ১৯৮২) অনুভূতিও স্বপ্নকাতরতাময়। পুরাকালীন পার্বত্য জনপদের সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ দিনগুলো আবার ফিরে আসুক, এ তার চাওয়া–

আজো আমি চেয়ে আছি স্বপ্নের প্রান্তরে
চেতনায় নতুনের মুগ্ধতার গান গাই;
কংরই পাখির সুরে নেচে উঠে প্রাণ
আমার অস্তিত্ব ফিরে পাবো একদিন।
জুমখেতে মুখরতা ছড়িয়ে পড়বে আবার
মুক্ত পাখি উড়বে আকাশের ঢালে-ঢালে,
পাহাড়ি কিশোরী ছুটে যাবে ঝিরি-ঝরনায়
সজীবতা ফিরে আসবে নতুন করে।
জুমিয়া নারীর সন্তান বীরদর্পে ফসল ফলিয়ে
জীবনকে গড়বে নিজের মতো করে
পাহাড়ের শান্তিময় পদধ্বনি আবার শুনতে পাবো
নবরঙে জীবন গড়ার প্রস্তুতিতে। (খান, ২০০৯)

মারমা কবিরা মূলত গান রচনায় বিশেষ মনোযোগী। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন এখানে খুব জনপ্রিয়। চথুই প্রু, মংসুই চিংসহ অনেক কবি মূলত গান রচনা করেন। মারমারা নিজস্ব ভাষায় সাহিত্যচর্চায় বেশ সাবলীল। আলোচ্য গবেষণায় বাংলা ভাষায় লেখা আদিবাসীদের কবিতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সমসাময়িক কয়েকজন তরুণ মারমা কবি বাংলা ভাষায় কবিতা চর্চা করেছেন। পু চ নু মারমা তেমনই একজন। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *মাসিক উত্তরাধিকার*, কার্তিক ১৪২০, ৫২তম সংখ্যায় 'প্রকৃতি' নামে তাঁর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটি নিম্নরূপ–

কেওক্রাডং পাহাড়ের
পথে সারি-সারি বৃক্ষ
এখনও তুষারে ঢাকা
দিনের শেষে হলুদ
পত্রালি উড়ে যায়
পাহাড়ের দাখিনা বাতাসে
আর ও দূরে
দূর দিগন্ত কিনারে
সূর্যাস্তের আভা লাল
পাথরে পা ফেলে
লাফিয়ে ঝোপ
থেকে বেরিয়ে আসে
হরিণ শাবক
এই যে প্রকৃতি
অলস জীবনধারা
এর শেষ কোথায়? (খান, কার্তিক ১৪২০)

মারমা কবিতা ও কবি বিষয়ক গবেষক চিং লামং চৌধুরীর অনুসন্ধান থেকে জানা যায়– মারমা কবির একক লেখা কবিতার মুদ্রিত কোনো বই প্রকাশ হয়নি।

এ ছাড়াও গবেষক প্রফেসর ড. আফসার আহমেদ-এর মতে–

মারমা ভাষা সঠিক উচ্চারণে বাংলায় স্থানান্তর একটি দুঃসাধ্য বিষয়। কাব্যবিচার করতে গেলে মারমা কবিতা শুধু নৃ-গোষ্ঠী কবিতাই নয়, বাংলা কবিতা ও আধুনিকতা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করবে। ... মারমা ভাষায় কবিতা কিংবা গানকেও আমরা আলাদা করতে পারি না। (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট খাগড়াছড়ি কর্তৃক আয়োজিত 'পার্বত্য চট্টগ্রামের কবি ও কবিতা' বিষয়ক সেমিনারে আলোচনার বক্তব্যে, ৩০ আগস্ট ২০১৪)

গ. অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর কবিতা

চাকমা-মারমা ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠী ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির ধারক। সহিত্যচর্চায় তাদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা। 'ককবরক' যা তিব্বত-বর্মীয় ভাষাগোষ্ঠীর থোড়ো শাখার অন্তর্ভুক্ত ভাষা। নিজস্ব ভাষায় কবিতা লেখা ত্রিপুরাদের কাছে সৃষ্টিশীলতার অবলম্বন। বরেন ত্রিপুরা, অলীন্দ্র ত্রিপুরা, সুরেন্দ্রলাল ত্রিপুরা, প্রভাংশু ত্রিপুরা, প্রশান্ত ত্রিপুরা, প্রতিভা ত্রিপুরা গান ও কবিতা লিখেছেন নিজস্ব ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষায়ও। ২০০৯ সালে প্রকাশিত হাফিজ রশিদ খান সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রামের কবিতার সংকলন *অরণ্যের সুভাসিত ফুল* বই এ প্রশান্ত ত্রিপুরার 'নির্বাসিত শব্দমালা' কবিতাটি স্থান পায়–

হে আমার নির্বাসিত শব্দমালা
মিছিলের শত শত আলোড়িত হৃদয়ে
তোমাদের ডাক এসেছে
শতাব্দীর বঞ্চনার বিস্ফোরণোন্মুখ
ক্ষোভে তোমরাও শামিল।

গিটারের স্মৃতিকাতর মুর্ছনায়
তোমাদের আরাধনা শুনছি
হে আমার অভিমানী শব্দমালা
আহত আবেগে পরিচর্যা ছেড়ে
নিষ্পেষিত মানবতার শৃঙ্খলিত
আন্দোলনে এসে দেখে যাও
আর কত জীর্ণ কুটির হিংসার দাবানলে
ছাই হবে?
আর কত সহস্র মানুষ পৃথিবীর খণ্ডিত
শরীরের উপর ছুটে বেড়াবে? (খান, ২০০৯)

২০০০ সালে রাঙ্গামাটি উপজাতি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট-এর সামায়িক পত্র *বৈসাবি*তে শোভা ত্রিপুরার দুটি বাংলা ভাষায় লেখা কবিতা 'উত্থান সময়ের নদীতে' ও 'চিম্বুক পাহাড়ে' প্রকাশিত হয়।

তঞ্চঙ্গ্যা পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম জাতিগোষ্ঠী। শ্রী বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, কার্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যাসহ বেশ কয়েকজন কবি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বাংলা ভাষায় কবিতাচর্চা করেছেন। সুপর্ণা তঞ্চঙ্গ্যার 'বিবর্তন' কবিতাটি বাংলা একাডেমির *মাসিক উত্তরাধিকার* ৫২তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়–

পরিবর্তনের হাওয়া
লেগেছে মানুষ গুলোতে
কারো প্রতি কোনো বিশ্বাস নেই,
সবাই সবাইকে ঠকাচ্ছে

স্বার্থের নেশায় ছুটছে অবিরত
মানছে না কোন ন্যায়নীতি
ভুলে যাচ্ছে অতীত স্মৃতি।
বুদ্ধি বিবেক লোপ পাচ্ছে–
আত্মার বন্ধন ছিন্ন হচ্ছে,
হারিয়ে যাচ্ছে মূল্যবোধ
সংসারে অশান্তির আগুনে
পুড়ে-পুড়ে জ্বলছে বুক–
কেউ বুঝে না কারো দুঃখ। (খান, কার্তিক ১৪২০)

কবিতায় অতীত স্মৃতি রোমন্থন নতুন কোনো ব্যাপার নয়– কালে কালে কবিরা তাঁদের অনুভবে ও কথামালায় সাজিয়ে তুলেছেন ফেলে-আসা দিনের স্মৃতি। এই যে অতীতে অবগাহন, তার সুন্দর রূপ পাওয়া যায় পার্বত্য অঞ্চলের বাংলা কবিতায়ও। জীবনের অনেকটা ধাপ পেরিয়ে কবিকে ক্লান্ত হতে দেখি স্মৃতিকাতরতায়।

চাকমা রাজবাড়িকে কেন্দ্র করে মূলত গত শতকে আদিবাসীদের প্রাতিষ্ঠনিক সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। রাজমাতা বিনীতা রায় পরিচালিত, অরূপ রায় সম্পাদিত *গৈরিকা* পত্রিকা ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়। এ প্রকাশনার মাধ্যমেই সম্প্রতিক কবি ও লেখকদের চাকমা সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। রাজমাতা বিনীতা রায় ছিলেন চাকমা রাজা নলিনাফ রায়ের রাণী। তিনি ছিলেন সুশিক্ষিতা ও সাহিত্যসেবী। চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, মারমা, ত্রিপুরারা পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে সচেতন এবং সংখ্যায়ও তারা বেশি। তার মধ্যে চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা সবার বেশি। তাঁদের কবিতা ও গানে পাহাড়ের অনাবিল সৌন্দর্য ও সঙ্গীতময়তা গভীরভাবে প্রেক্ষিত। আবার সংগ্রাম, স্বদেশপ্রেম ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র এসেছে সময়ের পরিবর্তনের অমোঘরূপে। জুম্মদের অকৃত্রিম আনন্দ ও সমর্থন, সুখ শান্তির স্বপ্ন প্রতিফলিত হয় সাদামাটা ভাষায়। এই সাবলীল ভাষা ও স্বদেশপ্রেম জুম্ম কবিতার বৈশিষ্ট্য। চাক, লুসাই, পাংখুয়া, বম, খ্যাং এবং খুমী উপজাতিদের সংখ্যা বর্তমানে খুবই কম, লোকসাহিত্যে এদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও কবিতায় এদের বিচরণ নেই বললেই চলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসকারী যে ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নাম জানা যায়, তাদের জনসংখ্যা বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যার তুলনায় একেবারে কম হলেও নানা দিক দিয়ে তাদের গুরুত্ব রয়েছে। যেমন- তাদের ভাষা ও বর্ণাঢ্য সংস্কৃতির বহুমাত্রিকতার বিচারে এর গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। বলা যায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের লোকজ সংস্কৃতি বাংলাদেশের জন্য এক মূল্যবান সম্পদ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম ক্ষুদ্রজাতিসত্তা ম্রো বা মুরং শুধু পার্বত্য বান্দরবানেই সুদীর্ঘকাল থেকে এদের বসবাস। খুব স্বল্পসংখ্যক ম্রো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। হাতেগোনা কয়েকজন মাত্র সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশী। সিং ইয়ং ম্রো (জন্ম : ১৯৭৪) এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ম্রো ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে তাঁর বেশ কিছু কবিতা স্থানীয় লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'ইয়াংবঙ' (চিম্বুক পাহাড়) কবিতার অংশবিশেষ–

এখানে বনাবৃত ঝরনার কলধ্বনি
অপরূপে ঘুমায় বিনিদ্র তন্দ্রালোকে
আকাশচুম্বী বৃক্ষরাজি, মৃত্তিকা, অরণ্য
জেগে থাকে আনন্দে চন্দ্রলোকে,
দূর পাহাড়ের সীমান্ত অপার যৌবনে
ডাকে পিছু স্মৃতির মণিকোঠায়
রঙিন প্রজাপতিরা ডানা মেলে

নিয়ে যাবে আমাকে কোন দূর অজানায়। (বড়ুয়া, ফেব্রুয়ারি ২০১১)

২০১৯ সালে সিংইয়ং ম্রো তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। *জ্যোৎস্না ভেজা পাহাড়* নামক বইটির প্রতিটি কবিতায় পার্বত্য লোকজ জীবন ও প্রকৃতির ছোঁয়া আছে। এ কাব্যের 'অরণ্যভূমি' কবিতায় কবি বলেছেন–

অর্কিড ফুলের মতো সুবাস ছড়ায়
গোধুলীর লজ্জার মতো স্নিগ্ধ হাসে
কণ্ঠে ঝরে পড়ে কবিতার ছন্দ।
কবিতাকে ভালোবেসে অপর্ণা মৃন্ময়ীর মতো
নিক্কণে সন্ধ্যা নামে গোধুলীর লগ্নে
চুড়ির শব্দে ঘুম ভাঙে কুয়াশার ভোর
নেচে উঠে ভোরের দোয়েল
চোখের মতো শত স্বপ্নের ভিড়।
নদীর মতো অবিরাম বয়ে চলে
নীলকণ্ঠ প্রেমের মতো নিবিড় কামিনী। (ম্রো, ২০১৯)

গিরি নির্ঝরিণী হ্রদ এবং অরণ্যের মায়ায় ঘেরা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম অরণ্য ও পাহাড়ের সমবায়ে গড়ে উঠেছে। এখানে চলমান নগরায়নের ছোঁয়া লাগলেও অধিকাংশ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী তাদের প্রকৃতিলালিত ঐতিহ্যবাহী ও পরম্পরাগত জীবনধারাকে বহন করে চলেছে আজও। ফলত এ জীবনের প্রতিভাস তাদের গীতিগুচ্ছ ও কবিতায় খুব স্বাভাবিক দাবিতেই অস্তিত্ববান। বলাবাহুল্য অস্তিত্বের এই সৌন্দর্য এখানকার প্রাকৃতিক বাস্তবতার অভিন্ন প্রকাশক ও উদ্দীপক। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন মনোমুগ্ধকর তেমনই সুন্দর এখানকার আধিবাসীদের ঐতিহ্যবহনকারী বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি, যার প্রভাব চিন্তনে ও মননে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের হৃদয় জুড়ে রয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবে সে প্রভাব পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্যক্ষেত্রে, বিশেষত কবিতায় ছড়িয়ে রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতির লাবণ্যমাখা কবিতার সৌরভ বাংলাদেশের সাহিত্যের বৃহত্তর অঙ্গনের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রয়েছে সুপ্রাচীন ও নির্দিষ্ট নিজস্ব সংস্কৃতি। তবে তাদের সাহিত্য খুব একটা প্রাচীন নয়। এ অঞ্চলের ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের ব্যপ্তি ছিল প্রধানত প্রচলিত উপকথা, রূপকথা কিংবা পুরাণ কাহিনি। লোককথা আর রূপকথার মোড়ক থেকে বেরিয়ে এসে কাব্য জগতের এ পথচলা একেবারেই নতুন। কিন্তু প্রবহমানবতার এ কাব্যচর্চাই হয়ে উঠেছে এখানকার মানুষের সমাজ আর রাজনৈতিক দর্পন। সমকালীন আদিবাসী কবিদের কবিতার বিষয়বস্তু কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, অনুভূতি এবং মানসপটে আঁকা বিচিত্র কাহিনি, যা চারপাশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সংগৃহীত। এসব কাব্য ভুবনের ঐতিহাসিক পটভূমি খুব একটা না থাকলেও অনুভবের বিচিত্র প্রকাশ সর্বক্ষেত্রে বিকশিত। তবে, আঙ্গিকের কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছিটেফোঁটা অবকাশ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এ প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামের কবিতাকে প্রতিবেশের অভিজ্ঞান কিংবা প্রতিফলন বলা যেতে পারে। সমকালীন বাংলা কাব্যের বাঁক বদলের সমান্তরালে আদিবাসী কবিদের কবিতাকে কোনোভাবেই মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। নিভৃতচারী এসব কবি একেবারে নিজের মতো করে পংক্তি সাজিয়ে সাধনার দীর্ঘপথ অতিক্রম করছেন। পাশাপাশি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রাচুর্যের মতো এখানকার কবিদের কবিতায় দৃষ্টিকাড়া উৎকর্ষ নির্মাণ করেছে নিজস্ব নন্দনতত্ত্ব। পার্বত্য চট্টগ্রামের এ কবিতার ধারা একদিন নিশ্চয়ই বাংলা কবিতার মূলধারার স্পর্শ লাভ করবে, খুঁজে পাবে নিজের সুনির্দিষ্ট গন্তব্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক কবির

কবিতায় সাহিত্যের ক্লাসিক রীতির অনুকরণ মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায়। তবে শেষ পর্যন্ত তা লোককাব্য বা লোকগীতির যৌগিক ভাবধারায় উপস্থাপিত। একদিন এসব কবিরা তাদের ঐতিহ্য সংলগ্ন কাব্যচর্চাকে বাংলা কবিতার ধারায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে বলে আশা করা যায়।

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম অরণ্য ও পাহাড়ের সমবায়ে গড়ে উঠেছে। এখানে চলমান নগরায়নের ছোঁয়া লাগলেও অধিকাংশ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী তাদের প্রকৃতিলালিত ঐতিহ্যবাহী ও পরম্পরাগত জীবনধারাকে বহন করে চলেছে আজও। ফলত এ জীবনের প্রতিভাস তাদের গীতিগুচ্ছ ও কবিতায় খুব স্বাভাবিক দাবিতেই অস্তিত্ববান। বলাবাহুল্য অস্তিত্বের এই সৌন্দর্য এখানকার প্রাকৃতিক বাস্তবতার অভিন্ন প্রকাশক ও উদ্দীপক। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন মনোমুগ্ধকর তেমনই সুন্দর এখানকার আধিবাসীদের ঐতিহ্যবহনকারী বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি, যার প্রভাব চিন্তনে ও মননে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের হৃদয় জুড়ে রয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবে সে প্রভাব পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্যক্ষেত্রে, বিশেষত কবিতায় ছড়িয়ে রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতির লাবণ্যমাখা কবিতার সৌরভ বাংলাদেশের সাহিত্যের বৃহত্তর অঙ্গনের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন।

আরণ্যক জনপদ পার্বত্য চট্টগ্রাম। পাহাড়ের প্রকৃতি আবেগ প্রকাশের উপযুক্ত স্থান। আর কবিতা আবেগ প্রকাশের উপযুক্ত বাহন। পাহাড়ে তাই কবিতার চাষ হবে– এটা স্বাভাবিক। একদিন এসব কবিরা তাদের ঐতিহ্য সংলগ্ন কাব্যচর্চাকে বাংলা কবিতার ধারায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে বলে আশা করা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্যচর্চার ধারাটি নানা কারণে আগেও নিয়মিত ও শক্তিশালী ছিল না, এখনও নয়। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অস্থিরতা, ভাষাগত সমস্যা, প্রান্তিকতা, সর্বোপরি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব এর মূল কারণ। নিয়মিত প্রকাশনা চালু না থাকার কারণে অব্যাহতভাবে সাহিত্যচর্চা করেন এমন সাহিত্যিক তিন পার্বত্য জেলায় খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যায় না। বছর শেষে বিঝু বা সাংগ্রাই উৎসবকেন্দ্রিক সংকলন আপাতত এ অঞ্চলের সাহিত্যকে চলমান রেখেছে। সমসাময়িক কিছু কবি-সাহিত্যিক নিজ উদ্যোগে গ্রন্থ প্রকাশ করছে, যা কিছুটা হলেও স্বস্তির। তিন পার্বত্য জেলায় উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট থাকলেও তাদের প্রকাশনা বিভাগের কার্যক্রম খুবই সীমিত। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং সমতলের সাহিত্য-সমালোচকদের মনোযোগ পেলে সামগ্রিকভাবে এ জনপদের সাহিত্যচর্চা আরো গতিশীলতা ও প্রাণময়তা লাভ করতে পারে।

তথ্যসূত্র

ইসলাম, রফিকুল (সম্পাদিত), *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১২) পৃ. ২১৭

খান, শামসুজ্জামান, (কার্তিক ১৪২০) *মাসিক উত্তরাধিকার*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ১২,১৯

খান, হাফিজ রশিদ, (২০০৯) *অরণ্যের সুবাসিত ফুল*, ঢাকা: পাঠসূত্র, পৃ. ২০,৪১

চাকমা, অমিতাভ, (১৯৯৫) *কোচপানা*, রাঙ্গামাটি: জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল, পৃ. ১২

চাকমা, মৃত্তিকা, (এপ্রিল ২০০২) *এখনো পাহাড় কাঁদে*, রাঙ্গামাটি, পৃ. ২৪

চাকমা, সুগত, (২০০৮) *বাংলাদেশ চাকমা ভাষা ও সাহিত্য*, রাঙ্গামাটি: উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, পৃ. ৫, ১২, ১৫, ১৬, ৫৭, ১৯২, ১৭৬, ১৮৯, ২৪৩, ২৪৬

চাকমা, সুহৃদ, (অক্টোবর ১৯৮৭) *বাগী*, রাঙ্গামাটি: প্রকাশক অর্চনা চাকমা, পৃ. ০২

চাকমা, সুসময়, (২০১৫) *সেমিনার সংকলন*, খাগড়াছড়ি: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীয় ইনস্টিটিউট, পৃ. ১০৩, ১০৭

চাকমা, শিশির, (২০১৪) *তে এব*, রাঙ্গামাটি, পৃ. ৪৪

ত্রিপুরা, সুরেন্দ্রলাল, (২০০১) *পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি*, রাঙ্গামাটি: উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, পৃ. ১৫,৩১

তালুকদার, সুপ্রিয়, (২০০৫) *নীলিমায় নীল*, চট্টগ্রামঃ প্রকাশক অঞ্জন দে, পৃ. ৪৪
বড়ুয়া, চৌধুরী বাবুল (ফেব্রুয়ারি ২০১১), *সমুজ্জ্বল সুবাতাস*, বান্দরবানঃ পৃ. ১৬১
ম্রো, সিংইয়ং, (২০১৯) *জ্যোৎস্না ভেজা পাহাড়*, ঢাকাঃ নব সাহিত্য প্রকাশনী, পৃ. ১৫
রায়, সলিল, (নভেম্বর ১৯৬৮) *দুঃস্বপ্ন*, রাঙ্গামাটিঃ পৃ. ৪৬ ,৭৪
দেওয়ান, হেমল ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *রান্যাফুল*, (রাঙ্গামাটিঃ প্রকাশক মনি স্বপন দেওয়ান, অক্টোবর ২০০৬), পৃ. ১৪, ২১, ৩১, ৩৫, ৪০, ৪৪, ৮৯, ১২২, ১২৭, ২৪৮